রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরে-বাইরে

পরিচ্ছেদ ১২

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে, কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল। বুঝলুম, নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান ! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই কিন্তু আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই ; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তি-বিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুল-মাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব ; আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট, তখন তুলি আর রঙের বাক্স।

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম ; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য ! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল ; বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এপার থেকে ওপারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল ; কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না ? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী ? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান ; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে

দেবার জন্যে বললুম, বাধা আছে, কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রাণী ?
বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হাঁ।
আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।
বলে আমি আমার পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্ সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।
বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না ; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।
বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা ! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল ! করতেও পারে।
এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই, কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।
তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে ! হর হর ব্যোম ব্যোম !
খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।
একটা চাষি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায় ? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরি শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্‌বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।
এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায় ? আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যাবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যাবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।
দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব ?
আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর

রসে ডুব মারো, রাধাভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।
আর বিলিতি গরম কাপড় ? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনো তাই করবে। তাতে তাদের শখ মিটবে না তা জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।
হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কি না। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি ; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না ? আমি বললুম, দায়টাকে কারো ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ো-পড়ো হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।
হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।
মিরজান সমস্তই বঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোর করে বললে, হুজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন--
আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে ?
তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না হুজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন--
বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকা জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।
বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আসবামাত্র চৌকি থেকে উঠে তাকে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।
বিমলা বললে, টাকা ? কত টাকা ?
আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।
বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।
আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।
টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলে, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কী করে বলবে যে 'পারব না' ?
আমি বললুম, রানী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয় ; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।
বিমলা বললে, দেব।
আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।
বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা দিতে হবে।
বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব ?
আমি বললুম, তার টাকা কি তোমার টাকা নয় ?
সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।
বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে ?
যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং !
‘বন্দেমাতরং’ এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর খুলবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং !
মন্দেমাতরং !
আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষজাত। বিধাতার ভাণ্ডারের কোনো লোহার সিন্দুককে আমরা রেয়াত করি নি, আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।
এই পুরুষদের দাবি মেটানোই হচ্ছে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে, সার্থক হয়েছে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, আর শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।
আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।
বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব ? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষজাত এইজন্যেই তো সকর্মক, আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন ?
বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে, যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন ? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী !
আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষমানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।
তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে ; এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার

ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম, কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইন্টার্‌মিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাক্‌রা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত এক বার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের ছদ্মবেশটা দু দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু-চার হাজারেই ঠেকেবে। তাই সই। 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' বলেছে ; কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো-আনা, এমন-কি, পনেরো-আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই ; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকা ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে ; লোকটা পুরোনো দাগি, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি, বিশেষত নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না।

নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায় ?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছি প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং, আর সেও বলছে বন্দেমাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক, যেটুকু পদার্থ টিঁকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন ; নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে ; সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে ; তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি,

কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক ; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।
তাই বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রায়াজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।
যাই হোক, টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনই যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।
ছটা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম দুটো এবং শেষ দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্যকালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো ; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ !
সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চলছে তখন সেটা তর্কে এসে নামবে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কী হবে ? এখন আমার কাজের ভিড়, অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক্, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলামাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।
এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।
নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।
আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।
নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও ?
আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী ?
নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটিমাত্র পথ আছে।
আমি জানি, সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে ! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুল্‌বয়। গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও

মানতে চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে ; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল ; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না ; আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে। এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিনেরও অন্ত নেই, অথচ এতবড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক দল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি ; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে-- আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি ?

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিম্বা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়েসে ওর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল হুহু করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে ? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ব'লে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার

প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারী তোমরাই, সেই পুজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইজন্যেই বলছি এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমিই দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা ? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা বাঙালির যে-একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে ব'লে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এই দুই দেবী তারই দুই-রকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্‌ জাত গড়তে পেরেছে ?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল ; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভালো। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে-রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে সে-রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যে-রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই-রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি ? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি-- জানি নে তুমি আমার কথা ঠিক বঝতে পার কি না। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্তলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক-রকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। এই প্রথম বিমলা আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন ; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার ; তোমারই কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে ; আর কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরেশাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায় ; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের

লোক জীবন পাবে। 'তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে-আসনে বসে ছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই। আমি যে, দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধিবিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল!

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না-- কান্না-- কান্না।

এই তো হিপনটিজ্‌ম্‌। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল; তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা; সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, তুমি গরিব কিসের? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনোদিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ। এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? কিন্তু আর সময় নেই।

সংকোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় ব'লে।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েছে; বোধ হয়

সারারাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ-আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই ; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে দেখছি পাঁচ হাজার, এমন-কি, তিন হাজার হলেও চলে যাবে।
হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।
যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল--
বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজবে না সে--
দেখ্‌ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।
এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা-- 'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'। 'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল' ! বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর। অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত, কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী ? আর, আমি মেয়েমানুষ, অত টাকা পাবই বা কোথা ? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য, সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক-- সেই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফসকাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে ?
বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পুজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পুজোটা হবে কবে এবং কখন ? নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অঘ্রানের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পুজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম-- যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে ! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই ; আজ ওরা বুঝতে পারছে কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে। যাক, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুজে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকম ভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে--
বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়--
আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই ?
কালই।
আচ্ছা কালই এনে দেব।

পরিচ্ছেদ ১৩

--www.arshi.org--------------------------------